কোয়ান্টাম মেথড্

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঃ একটি পর্যালোচনা

মুফতী শরীফুল আজম

মুরাকাবা ইলমে তাসাওউফের একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। যুগ যুগ ধরে ওলি আউলিয়াদের মাঝে এর চর্চা হয়ে আসছে। মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। সদা এক আল্লাহর স্মরণ অন্তরে থাকলে মানুষের পক্ষে তাঁর নাফরমানী সম্ভব নয়। মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন এবং আমার সাথে আছেন এই বোধ জাগ্রত করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈলে যাকে 'ইহসান' বলে সঙ্গায়ীত করা হয়েছে। ''তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ, আর তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন''। মুরাকাবার মাঝে মনকে সকল ধরনের চিন্তা মুক্ত করে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুধু মাত্র একটি বিষয়ে ভাবা হয়। এবং লাগাতার দীর্ঘ সময় ধরে অনবরত কল্পনা করা হয়।

ইসলামের এই মুরাকাবার ন্যায় অন্যান্য ধর্মের সাধকদের মাঝেও আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য মন নিয়ন্ত্রনের সাধনা করতে দেখা যায়। হিন্দু যোগীদের যোগ্যধ্যান এবং বৌদ্ধদের বিপাসন ধ্যান এর অন্যতম। তবে মুসলমান সূফী-ওলীদের মুরাকাবা আর অমুসলিমদের ধ্যান বা যোগ সাধনার মাঝে তফাত সাত সমুদ্রের। কারণ প্রত্যেকেই এর রিয়াযত মুজাহাদা বা সাধনা করে থাকে নিজ নিজ ধর্মের আক্বিদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতির অনুসরণে। ইসলাম একমাত্র একত্ববাদের ধর্ম, আর বাকী সব বহু ইশ্বরবাদে বিশ্বাসী নাস্তিক যেমন বৌদ্ধ সমাজ। কাজেই ধ্যানের ক্ষেত্রেও এসকল বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ধ্যান- মুরাকাবার মৌলিক উৎসের মাঝে গবেষণা করে পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেছেন মন নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি, যার নামকরণ করা হয়েছে 'মেডিটেশন'। তাদের গবেষণায় বের হয়ে এসেছে মন-মস্তিস্কের মাঝে ধ্যানের প্রভাব। তারা দেখতে পেয়েছে যে ধ্যানের মাধ্যমে মানুষের মনে যে বিষয় গেথে দেয়া হয় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে অনুসারে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মনের বিশ্বাস অন্য অঙ্গকে প্রভাবিত করে। রোগ মুক্তি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই ধ্যানের ফরমুলা অনুসরণ করে এক জন রোগীর মনের অবস্থা পরিবর্তন করা গেলে অনেকটা সফলতা পাওয়া যাবে। ৬০/৭০ দশকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মাঝে এনিয়ে চলে ব্যাপক গবেষনা। এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানষিক ও শারীরিক উভয় ধরনের রোগ সারাতে মেডিটেশন কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারে। এসকল গবেষণার মাঝে অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষক ডা: হার্বার্ট বেনসন। দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তার 'রিলাক্সেশন রেসপন্স' গ্রন্থে তিনি লেখেন যে, একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে মেডিটেশন বা প্রার্থনা করে কিভাবে অনিদ্রা, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা এবং ব্যাথা-বেদনায় আক্রান্ত রোগীরা আরোগ্য লাভ করতে পারে। তিনি বলেন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণে যে রোগ-বালাই হয় প্রচলিত চিকিৎসায় তাতে খুব একটা কাজ হয় না। বরং ৬০- ৯০% নিরাময় হয় রোগীর বিশ্বাসের কারণে। 'আমি সুস্থ হবো' এ বিশ্বাসের ফলে রোগীর দেহের নিউরো-ইমিউনোলজিকেল সিস্টেম নতুন উদ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠে, বদলে যায় রোগের কোষগত নেতিবাচক স্মৃতি। এ বিশ্বাসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'প্লাসিবো ইফেক্ট'। তদ্রূপ ক্যালিফোর্নিয়ার কার্ডিওলজিষ্ট ডা: ডীন অরনিশের গবেষণায় বেরিয়ে আসে হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশনের কার্যকারিতা। বাইপাস সার্জারি বা এনজিও প্লাস্টি ছাড়াও হৃদরোগের চিকিৎসা সম্ভব

তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে ৪০ জন গুরুতর হৃদরোগীকে এক বছর ধরে মেডিটেশন যোগব্যায়াম ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার গ্রহণ করানোর মাধ্যমে হৃদরোগ থেকে মুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মেডিটেশন নামক বৈজ্ঞানিক ধ্যান পশ্চিমা সমাজে। টাইম ম্যাগাজিনের আগষ্ট ২০০৩ সংখ্যার 'দি সায়েন্স অফ মেডিটেশন' প্রচ্ছদ নিবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ১ কোটি মানুষ এখন নিয়মিতভাবে মেডিটেশন করছে।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরাময়ের জন্যে এই মেডিটেশন চর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো বাংলাদেশে প্রচলিত কোয়ান্টামের মেডিটেশন। এখানে নিরাময়ের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। নিরাময়ের বিশ্বাসের স্থলে প্রবর্তন করা হয়েছে 'মুক্ত বিশ্বাস'। দ্বীন ইসলাম যেভাবে আক্বায়েদ (বিশ্বাস) আ'মাল, মুয়ামালা, মুয়াশারা, ও আখলাক এই পাঁচ ভাগে মানুষকে জীবন বিধান দিয়েছে তদ্রুপ কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্ট করা হয়েছে। 'সফলতার পঞ্চসূত্র' নামে পাঁচটি মনগড়া বিষয় ঠিক করা হয়েছে সঠিক জীবনদৃষ্টি অর্জনের জন্যে। এই জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে যে কোন ধর্মের লোক নিজ ধর্মে অবিচল থেকেও সে হতে পারে এক 'অনন্য মানুষ' ইনসানে কামেল। সুখ-শান্তি, সফলতা ও সুস্বাস্থ্য সবই অর্জন সম্ভব এই সূত্র অবলম্বনে।

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক (আসল নাম জানা নেই) বাংলাদেশের এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। তিনিই উদ্ভাবন করেছেন 'কোয়ান্টাম মেথড' নামক এই বৈজ্ঞানিক ধ্যান পদ্ধতি। যদিও তিনি ডা: বেনসন বা ডা: ডীন অরনিশের মত চিকিৎসাবিদ নন। কিন্তু তাদেরই বাতলানো বৈজ্ঞানিক ফর্মূলা থেকে সূত্র সংগ্রহ করে নিজের গবেষণালব্দ জোতির্বিদ্যার বিভিন্ন দর্শন যোগকরে আবিস্কার করেছেন এক আলাদিনের চেরাগ মার্কা ধ্যান 'মেডিটেশন'। এতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের লোকদের আকৃষ্ট করতে সকল ধর্মের কিছু কিছু আদর্শ বিশ্বাস ও রীতিনীতির মিশ্রণ করা হয়েছে। তাই কোয়ান্টাম মেথড পশ্চিমাদেশে প্রচলিত নিরাময়ের মেডিটেশন পদ্ধতি নয় বরং একটি জীবন ব্যবস্থা ও মতবাদ। যেখানে ধ্যান চর্চার নামে বিজ্ঞান ও সকল ধর্ম-মতবাদের সমন্বয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক অনেকটা বাদশাহ আকবরের ভ্রান্ত দ্বীনে এলাহীর মত।

শহীদ আল-বোখারীর এ প্রচেষ্টার সূচনা হয় প্রায় ৩ যুগ আগে ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন মাসিক ঢাকা ডাইজেস্টে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে তার এবিষয়ক অনেক লেখা প্রকাশিত হয় সপ্তাহিক বিচিত্রায়। বাংলাদেশের অকাল্ট অনুরাগীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ এস্ট্রলজার্স। ১৯৮০ সালে এই যোগধ্যান চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে ঢাকার শান্তিনগরে অফিস স্থাপনের মাধ্যমে। এর পর ১৯৮৩ সালে মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা হয়। যা ১৯৮৬ সালে যোগ ফাউন্ডেশন নামে রূপান্তরিত হয়। ধ্যানের স্তরে পৌঁছার প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্যে চলে গবেষনা। এভাবে কোয়ান্টামের প্রতিটি টেকনিক নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিক্ষা নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়। ৯০ দশকের শুরুতে এটি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। এরপর সাধারণ লোকের মাঝে এর পরিচিতি তুলে ধরার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। শহীদ মহাজাতক ১৯৯২ সাল থেকে দৈনিক ইত্তেফাক ও মাসিক উপমা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় শিথিলায়ন ও মেডিটেশন সম্পর্কে লেখা শুরু করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে মাসিক রহস্য পত্রিকায় দীর্ঘদিন নিয়মিত আত্মনির্মাণ বিভাগে লেখেন। সর্ব সাধারণের জন্য ৪ দিনের মেডিটেশন কোর্স চালু করা হয় সর্ব প্রথম ১৯৯৩ এর ৭ জানুয়ারী হোটেল সোনারগাঁওএ। এর পর দীর্ঘ ১৭ বছরে বর্তমান ৩০০ এর অধিক কোর্স পরিচালনা করেন তিনি নিজেই।

আমাদের দেশের লাখ লাখ লোক এ যাবত তার কাছে কোর্স গ্রহণ করেছে। মূলত বিভিন্ন শারীরিক ও মানষিক সমস্যায় জর্জরীতরাই তার কাছে যায় নিরাময়ের আশায়। কিন্তু নিরাময়ের নামে তাদেরকে দিক্ষা দেয়া হয় নতুন এই মতবাদের। অনেকের কাছে তার কর্মকান্ড ইসলাম বিরোধী মনে হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য সেখানে রয়েছে জ্ঞানপাপী

দরবারী আলেম। যিনি কোয়ান্টামের সকল কুফরী মতবাদকে শরীয়ত সম্মত বলে চালিয়ে দেন। বাদশাহ আকবরের দরবারে যেমনটি করতেন মাও: আবুল ফজল। তবে একোর্সে আগত লোকেরা সবচেয়ে বিব্রতবোধ করেন সব ধর্মের লোককে এক সাথে বাইয়াত করে মুরিদ বানানোর মুহূর্তে। কিন্তু তবুও তাদের মোহ ভাঙ্গেনা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায়। আজ মুসলমানদের সব চেয়ে বিপদের কারণ হচ্ছে এই ধর্মীয় অজ্ঞতা। বৈষয়িক জ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জনে কমতি নেই, কিন্তু
ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তারা
জ্ঞান রাখেনা বা প্রয়োজন মনে করে না।

ইসলাম আর কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে কিছু অক্বিদা-বিশ্বাস ও আমল বা আচার আচরন। আক্বিদা বিশ্বাসে গড়মিল হলেই মানুষ ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। কোয়ান্টাম সকল ধর্মের প্রতি উদারতা বা সমন্বয় করতে গিয়ে ইসলামের মৌলিক আক্বিদা বিশ্বাস কে বিসর্জন দিয়েছে অতি কৌশলে, যা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না। কোয়ান্টামের জীবনদৃষ্টি অনুসরণ করে ধ্যান চর্চার মাধ্যমে অনেকের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার যে কথা শুনা যায় তা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মনে করতে হবে, কোন জিনিস উপকারী হলেই তা বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হয় না বরং বৈধতার বিষয়টি কোরআন-হাদীসের বিধি বিধানের উপর নির্ভর করে। জুয়া ও মদের কথাই ধরুন, কোরআন করীমেই এতদুভয়ের উপকারিতার কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে হালাল করা হয়নি। (বাকারা ২৯৯) বুঝা গেল উপকারী হলেই হালাল হয় না। কোয়ান্টামের কার্যক্রম ও মতাদর্শ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এর অসংখ্য বক্তব্য সরাসরি
কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে সংক্ষেপে তার কয়েকটি আলোচনা পেশ করা হল।

(ক) কোয়ান্টাম কোর্স করতে প্রথমে একটি প্রত্যয়ন পাঠ করানো হয়। এই প্রত্যয়নই হলো কোয়ান্টামের মূল চালিকা শক্তি। যেখানে বলা হয় "অসীম শক্তির অধিকারী আমার মন, যা চাই তাই পাবো, যা খুশি তাই নেব"। অর্থাৎ কোয়ান্টামের বিশ্বাস হল সকল শক্তির উৎস মানুষের মন। (নাউযুবিল্লাহ) পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি চাইলে হয়, নতুবা হয় না। মানুষ কোন কিছু আল্লাহর দান ছাড়া অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ পাক ছাড়া সব কিছু সসীম, একমাত্র তিনিই অসীম। মনের শক্তিকে অসীম বলা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে "সবকিছু আল্লাহর মুষ্ঠি বলয়ে"। (সূরা নিসা-১২৬) "তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা আত তাকভীর-২৯) "মানুষ যা চায় তাই কি পায়? অতএব পরবর্তী ও পূর্ববতী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে। (সূরা আন নজম ২৪-২৫)

(খ) ইসলামের মাঝে একটি ভ্রান্তদল অতিবাহিত হয়েছে যাদের কে ক্বাদরিয়া বলা হতো। এরা তাক্বদীরকে অস্বীকার করত এবং মানুষকে ক্বাদেরে মুতলক্ তথা স্বাধীন ও সর্বশক্তির অধিকারী মনে করত। মানুষের সকল কাজের স্রষ্টা মানুষ নিজেই বলে বিশ্বাস করত। কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেও তাক্বদীর তথা ভাগ্যের লিখনিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এবং মানুষকে ভাগ্য বিধাতা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোয়ান্টামের প্রসিদ্ধ উদাহরণ সার্কাসের হাতির কথাই ধরা যাক। ''জঙ্গল থেকে হস্তি শিশুকে ধরে এনে লোহার ৬ ফুট শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে রাখতে সে বড় হয়েও ৬ ফুট বৃত্তকে তার নিয়তি মনে করে। অথচ এখন সে বড়, তার দেহের প্রচন্ড শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় শিকল ভেঙ্গে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু মনোজাগতিক নিয়তির শৃংখল তাকে পরিনত করে অসহায় প্রাণীতে। এমনকি সার্কাসে আগুন লাগলে হাতি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেনা''।

কোয়ান্টামের এই উদাহরণ দ্বারা নিয়তির শৃঙ্খল ভেঙ্গে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং তাক্বদীরকে ভ্রান্তবিশ্বাস ও মনোজাগতিক শৃঙ্খল আখ্যা দেয়া হয়েছে। যা সরাসরি কোরআন হাদীস অস্বীকারের শামীল। ইসলাম বলে তাক্বদীরের ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হাদীসে জীবরাঈলে যে সকল বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে
তাক্বদীর বা ভাগ্যের লেখন। তবে

এর অর্থ এই নয় যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বরং অল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকতে হবে এবং সৎপথে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আর বিশ্বাস রাখতে হবে ভাগ্যের লেখনের উপর। ছাহাবায়ে কেরাম নবীজী (সা) কে এব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তবে আমল করে কি হবে? উত্তরে নবীজী (সা:) বলেন, كل ميسر لما خلق له ''প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ হয় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে''। হযরত আলী (রা:)কে কেউ তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, এক পা উঠাও, লোকটি উঠালো। এর পর বললেন, অপর পা উঠাও, তখন সে অপারগতা প্রকাশ করল। এটাই হলো তাক্বদীর, মানুষ এক কদম বাড়াতে পারে কিন্তু চুড়ান্ত কিছু করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। সার্কাসের হাতির মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কথাও ইসলাম বলে না, আবার কোয়ান্টামের মত নিয়তির শিকল ভেঙ্গে ফেলার কথাও বলে না। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষ চেষ্টার মালিক আল্লাহ দেবার মালিক। তিনি মঞ্জুর করলে বান্দার চেষ্টা সফল হবে, অন্যথায় হবে না।

কোয়ান্টাম বলে "মানুষ নিজেই পারে নিজের সব কিছু বদলে দিতে। রোগকে সুস্থতায়, অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যেই রয়েছে।'' পক্ষান্তরে ইসলাম বলে হায়াত-মউত, সুস্থতা-অসুস্থতা, রিযিক, দৌলত বা মান সম্মান সব কিছুরই মালিক আল্লাহ। এসব বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন, মানুষ এতে কোন রদ বদল করার ক্ষমতা রাখেনা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ''যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (সূরা শুআ'রা- ৮০-৮১) ''তারা কি দেখেনা যে আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা রূম- ৩৭) ''তুমি বল আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা ইউনুস ৪৯) কাজেই মানুষ নিজেই পারে সব কিছু বদলে দিতে, কোয়ান্টামের এমন বিশ্বাস কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।

(গ) কোয়ান্টামের মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক। কাজেই যে কোন ধর্ম পালনই যথেষ্ট। কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে সকল ধর্মই গ্রহণযোগ্য। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ:৯) পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। বাকী সব ধর্ম কুফরী মতবাদ ও ভ্রান্ত। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : ''নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন এক মাত্র ইসলাম''। (সূরা আলেইমরান-১৯) ''যে লোক ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না। এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আলেইমরান- ৮৫) তাছাড়া স্রষ্টার সত্ত্বা ও গুনাবলীর সংজ্ঞা প্রত্যেক ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন। খৃষ্টানরা তৃত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে পিতা, পুত্র ও মেরী এই তিন প্রভু মিলে হয় গড। হিন্দুরা ব্রক্ষা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের সমষ্টি ওঁম এর পূজারী। তাছাড়াও তাদের রয়েছে ৩৩ কোটি দেব-দেবী, এবং তারা ভগবানের জন্ম-মৃত্যু ও জয়-পরাজয়ে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই, সব কিছু প্রকৃতিগত ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। আর ইসলাম বলে আল্লাহ এক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। অর্থাৎ ইসলাম একমাত্র একত্ববাদের ধর্ম, বাকী সব বহু ইশ্বরবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদ। স্রষ্টাকে নিয়েই যেখানে এত মতভেদ সেখানে ধর্মের মূল শিক্ষা বলতে আর কি বাকী থাকে?! তাই কোয়ান্টাম সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক বলে যে মতবাদ প্রকাশ করেছে তা একটি অবাস্তব ও কুফুরী মতবাদ।

(ঘ) ''কোয়ান্টাম প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিক ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে''। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ: ১৪৩) কোয়ান্টামের এই ঘোষণা বা উৎসাহ প্রদান খোদাদ্রোহীতার শামিল। কেননা আল্লাহ পাক সকল আহলে কিতাব, মুশরিক ও পৌত্তলিকদের কোরআনের মাধ্যমে বার বার ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিজেদের কুফুরী ধর্মে অটল থাকার ভয়াবহ পরিনতির কথা বুঝিয়েছেন। এর বিপরীত কোয়ান্টাম প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান

করে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: '' আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো।'' (আলেইমরান -১১০) ''আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করতাম''। (মায়েদা-৬৫) আর ইসলাম গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে পরিনতি কি হবে তাও বলা হয়েছে: ''যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহয্যকারী নেই।'' (আলেইমরাম-৯১)

পবিত্র কোরআনের এধরনের স্পষ্ট বক্তব্যের পরে কেউ যদি মানুষকে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদান করে তাহলে তা কিছুতেই মানুষের মঙ্গল কামনা হতে পারে না, বরং তা হবে প্রবৃত্তি পূঁজা ও ধোঁকাবাজী। সব ধর্মের লোককে খুশি করার মাঝে কোয়ান্টামে কি স্বার্থ রয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এধরনের মতাদর্শের অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়াতে কিছু পেলে পেতে পারে তবে পরকালে রিক্তহস্ত হওয়া নিশ্চিত। এখন যদি কেউ পরকালেই বিশ্বাসী না হয় তবে তাকে বুঝানোই বেকার।

(ঙ) কোয়ান্টাম যেহেতু সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের প্রবক্তা তাই সে সব ধর্মের কিছু কিছু ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা নেই তাই মানুষকে কেউ সৃষ্টিও করে নাই, বরং মানুষের জন্ম-মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক প্রবাহের মত অনবরত প্রবাহিত হয়ে চলছে। এখানে কেউ কাউকে সৃষ্টি করেনি। বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের আদিও নেই অন্তও নেই। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্তমতবাদ পৃ: ৬৬০) কোয়ান্টাম বৌদ্ধ ধর্মের এই মতকে গ্রহণ করে নিজেও হুবহু একই মত পোষণ করেছে। কোয়ান্টাম কনিকার ১৫ নং পৃষ্টায় বলা হয়েছে ''আপনি কসমিক ট্রাভেলার-মহাজাগতিক মুসাফির। আপনার জন্ম নেই মৃত্যু নেই।'' জন্ম যদি না থাকে তাহলে জন্মদাতা ছাড়াই মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মানে প্রাকৃতিক ভাবেই সব হচ্ছে স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। (নাউযুবিল্লাহ) একই পুস্তকে ২১ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়"। এখানেও প্রকৃতিকে স্রষ্টা মানা হয়েছে, যা বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস। অথচ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে '' আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অত:পর রিযিক দিয়েছেন, এর পর তোমাদের মৃত্যু দিবেন, এর পর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।'' (সূরা রূম -৪০) ''কল্যাণময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন। এবং এতে রেখেছেন সূর্যও দীপ্তিময় চন্দ্র"। (ফোরকান -৬১)

কথা অনেক লম্বা হয়ে গেল তাই আর দীর্ঘ না করে যারা কোয়ান্টাম কোর্স করতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলেই শেষ করছি। শহীদ আল বোখারী এক জন জ্যোতিষী ও স্বঘোষিত সর্বদ্রষ্টা। (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামে এধরনের জ্যোতিষ বিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় বিদ্যার চর্চা সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। কোয়ান্টামের কমান্ড সেন্টার অধ্যায়ে যা কিছু শেখানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ঈমান বিধ্বংসী। আপনারা হয়ত জানেন না যে, এধরনের জ্যোতিষীদের কাছে গমন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী ঈমান বিনাশী। নবীজী (সা:) বলেন ''যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে গমন করল এবং তার কথাকে সত্যায়ন করল সে যেন মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ দ্বীনকে অস্বীকার করল।" অপর হাদীসে বলা হয়েছে, ''যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে কোন বিষয় জানতে চাইল তার ৪০ দিনের নামায কবুল করা হবে না"। (সুনানুল কুবরা- ৮/১৩৮)

অতএব কোয়ান্টামের এসকল ঈমান বিধ্বংসী কর্মকান্ড ও কুফরী মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

লেখক: উস্তাদ, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
১৪,১৫,১৬ জানুয়ারী ২০১৩ইং
সোম, মঙ্গল ও বুধবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।